শিক্ষাচিন্তা ও জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ

ড. সনৎ কুমার ঘোষ [১৯]

সারসংক্ষেপ :

এ বিশ্বজগতে এমন অনেক জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী মানুষ জন্ম গ্রহণ করেন যাঁরা আপন আপন জ্ঞান ও
দিয়েই এই মরজগতে অমর পুরুষ রূপে খ্যাত হয়ে থাকেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনই এক
৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ভারতে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিস্তৃত পাট ভূমিতে তাঁর
াদচরণা নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও তিনি শিল্পী এবং দার্শনিকও।
এমন কোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নেই, যেখানে তাঁর চিন্তার ছোঁয়া লাগেনি। জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর
ফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের কল্পচিত্রই বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, রবীন্দ্র সাহিত্য সৌন্দর্যের
ালে আমরা দেখতে পাব - তাঁর ভাষায় মাধুর্য, কল্পনার অভিনবত্ব, ভাবের গভীরতা, রসের প্রাণস্পর্শিতা
টিরই তুলনা হয় না। সমাজ সচেতনতা, দেশপ্রেম, সৌভাতৃত্ববোধ, সংহতি ও বিশ্বজনীনতার শিক্ষা, ধর্মীয়
নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি নানান আঙ্গিকে পরিস্ফুটিত। আশ্রমিক শিক্ষার পটভূমিতে শিক্ষার প্রয়োগিক রূপটিও
তাৎপর্যপূর্ণ। আশ্রমিক বিদ্যালয়ে তিনি কর্ম ও জীবনমূখী শিক্ষার যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন তার দার্শনিক
তাৎপর্য যে সুদূঢ় প্রসারী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন শুধু মাত্র তত্ত্ব চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ
থাকেনি। তিনি শিক্ষাকে অশক্তকে শক্তি দেবার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। গবেষণামূলক এই প্রবন্ধের
দিয়ে গবেষক রবীন্দ্রনাথের জীবনমুখী শিক্ষার স্বরূপ ও তার জাতীয় জীবনে গুরুত্বকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

মূলশব্দ - শিক্ষা, জাতীয় জীবন

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন শিক্ষাচিন্তা মূলক প্রবন্ধাদি পত্র-পত্রিকা শিক্ষামূলক ভাবন
ভৃতি থেকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাচিন্তা বিষয়ে একটা ধারণা গড়ে তু
। উপনিষদীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত কবির জীবন - দর্শনের মূল বক্তব্য হলো বিশ্ববৈচিত্রের
ধ্যে এক অধ্যাত্মিক শক্তি বিরাজমান।

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিনী ।'[১]

আপাত দৃশ্য বিচ্ছিন্ন বিচিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমন্বিত সমগ্রের বোধ কী করে আনা যায় - রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বানী তারই ইঙ্গিত বহন করে। শিক্ষা ও সমবায় এই দু'টি হচ্ছে রবীন্দ্র সাধনার মূল বিষয়। তিনি বিশ্ব মানাবাত্মার পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন 'তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না। যা বিশ্বসত্ত্বার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।'

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষা জীবনকে সংহত করে। সুপ্ত চেতনার বিকাশ প্রক্রিয়ায় অবিন্যাস

---

[19] অধ্যাপক, কাটোয়া কলেজ

বিন্যাস, অপরিণতি থেকে পরিণতি ও পরিণামে সংহত জীবনই হলো শিক্ষা। শিক্ষা ে
ক্তি যা অন্ধকার দুর করে আলোতে নিয়ে আসে, শিক্ষা জগৎ ও জীবন প্রকৃতির সুপ্ত স
উদ্ভাসিত করে দেখতে সাহায্য করে। মানুষের জীবনের অনেক দিক আছে। তার জৈবি
ামাজিক, সাংস্কৃতিক আত্মিক ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের জন্যই ব্যক্তিকে শিক্ষা লাভ
তে হয়, সাধনা করতে হয়। শিক্ষাই আনে জীবনের সার্থকতা। মানুষের সাংস্কৃতিক
াসা একমাত্র শিক্ষাই মেটাতে পারে। মানুষের অনির্বান জিজ্ঞাসা, সুন্দরের পিপাসা,
সত্যকে জানার ইচ্ছা চিরকালের, মানুষের শিক্ষা লাভের আয়োজন অনুষ্ঠানও তার
্যকালের। শিক্ষার তাৎপর্য গভীর -এ কেবল কৌশল আয়ত্ত করা নয়, কোনো কিছু
খা নয়, সমগ্র জীবন ও জগতের মধ্যে সেতু বন্ধ রচনা করতে পারাই রবীন্দ্রনাথের মতে
ক্ষা।

"নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও,
অনন্ত অকাশে
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।"

ছাত্রসম্ভাষণ, ফাল্গুন ১৩৪৩

বীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষার লক্ষ্য ও জীবনের লক্ষ্য অভিন্ন ছিল। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলা এবং আমাদের ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ করতে সাহায্য করা, শিক্ষার দ্বারা জীবনে গতি সঞ্চার করা। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল চিত্ত গঠন করা, সজীব ও বিচিত্র প্রকৃতিই পারে শিশুমনের চিত্ত গঠন করতে, পাথরে বাঁধানো নির্জীব শহর একাজে সহায়ক নয়। ভারতবর্ষের সাধনা বিশ্বের সাথে চিত্তের যোগ সাধনা কর া। কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকেও আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। এই বোধের জাগরণই রবীন্দ্র শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। আর একা জ সঠিকভাবে করতে পারলে তবেই মনের মধ্যে উৎসুক্য জাগবে; উৎসুক্য ছাড়া অর্থাৎ নিরোৎসুক্যই হলো অন্তরের নির্জীবতা। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো জীবনের পূর্ণতা- প্রাপ্তি। আশ্রমের শিক্ষা ছিল পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা, জীবনে পূর্ণতা আনয়নের শিক্ষা, জীবনকে বড় করে দেখতে শেখার শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো শিশুর মধ্যে সামাজিক বিকাশ সাধন করা, সমাজের সাথে শিক্ষার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মিলন ঘটানো। আপনাকে আপনাতেই সে বদ্ধ রাখে সে হয় লুপ্ত , আর আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। জীবনের এই প্রকাশই জীবনের সত্য বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে ধর্ম শিক্ষাকে ও রবীন্দ্রনাথ স্থান দিয়ে বলেছেন - "এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্র প্রকৃতিগত ।"[২] কাজেই যেখানে শিক্ষার সঙ্গে মান বপ্রকৃতির ঘনিষ্ট যোগ -সাধন, শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সহজ ভাবেই ধর্ম শিক্ষার প্রসঙ্গও

এসে যায়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্ম কর্তৃত্ব জাগিয়ে তোলাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের স্বাজাত্যের অভিমান থেকে মুক্তি দেয় তাই হলো জাতীয় শিক্ষা। তিনি মনে করেন 'প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধানার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখা -প্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা।'[৩] তিনি মনে করেন শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের মাটির সঙ্গে মিলন রচনা করা। এই আন্তরিক প্রেরণা থেকেই বিশ্বভারতীর জন্ম। সত্য লাভের ক্ষেত্রে প্রাচ্য পাশ্চাত্য বলে কিছু নেই -

'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে -
এর ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।'

অর্থাৎ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন ঘটানোই হবে শিক্ষার অত্যতম লক্ষ্য।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদেশি ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রসঙ্গে বলেছেন - ''যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, আকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার একটু ল স্থান নাই , ইহাতে কি ছেলের বাসনা, মানসিক পুষ্টি, চত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে ?''[৪] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ বিকাশের দৃষ্টিকোন থেকেই পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা করতে চেয়েছেন। মানসিক সংস্কৃতির যথার্থ মূল্য স্বীকার করে ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুস্থ মানসিক দৃষ্টি ভঙ্গীর স্বার্থে তিনি পৃথক ভাবে রামায়ণ মহা ভারতের পাঠের কথা বলেছেন। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি পাঠ্যক্রমে স্থান দিয়েছেন। কারু ও চারুকলা - বিশেষত শিল্প, সংগীত ও নৃত্যের গুরুত্বকে তিনি স্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ''আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞান চর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয় , সকল রকম কারুকলা, শিল্প, নৃত্যগীত, বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত সাধনের জন্য সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করবো। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষেই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি।''

এই প্রসঙ্গে ভাষা শিক্ষার প্রশ্নটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি মাতৃভাষার প্রতিই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গতানুগতিক শিক্ষা সম্পর্কে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে 'আর ইংরাজী শিখতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্য রাজ্যে প্রবেশ করিবার ও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনা রাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল।'[৫] রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছেন। তাই বলে তিনি ইংরেজি ভাষাকে বর্জন করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্বাত্যের মিলন ঘটিয়ে তার সারাংশটুকু গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ''... বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। ওই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা এক সঙ্গে বাহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে,

ইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।''[৬]

থ গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের কৌশল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকম। এ সম্পর্কে শিক্ষাবিধি প্রবন্ধে তিনি বলেছে ত্তের গতি অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এব কে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এই জন্যই কোন দিনই কোন একজ কোন একজন লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির ই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্য পথ আবিস্কারের একমাত্র পন্থা।'' তিনি করেন শিক্ষা হবে জীবন যাত্রার অঙ্গ, এক তালে চলবে ক্লাস নাম ধারী খাঁচার জিনিস না। পুঁথির ভাবে জর্জরিত হওয়ার পরিবর্তে বস্তু সংগ্রহ, পশুপালন, বাগানের কাজ, মূলক কাজ, খেলাধূলা, গল্প বলা, সংগীত, নাটক, ঋতু উৎসব পালন, হাতের কাজ, বেশ পরিচিতি, চড়ুই ভাতি, দেওয়াল পত্র ও ম্যাগাজিন প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ স্বাধীন দ্যগই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনত বিশ্বাসী থাকলেও শিক্ষার্থীদের ব্রহ্মচর্য পালনেরও পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য নের মধ্য দিয়ে যেমন আত্মার সংযমের কথা বলছেন তেমনি দেহ মনের শিক্ষার জন্য ধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন। এই স্বাধীন ভাব থেকে সৃজন প্রতিভার বিকা ঘটবে এবং তার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থী নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত করবে। এ বিষয়ে দম্বরীতে দেওয়া বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য। ''তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে ফিরে আসা টল হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে জাগে, সেখানে গোরু-চরানো, গোদোহন, সমিধ-কুশ াহরণ, অতিথি পরিচর্যা, যজ্ঞ - বেদী রচনা আশ্রম বালক-বালিকাদের দিনকৃত্য''।[৭] বস্তুত য়াসের যে পদ্ধতি তিনি নির্দেশ করেছেন তারই প্রয়োগ ঘটেছে সহ জপাঠ গ্রন্থমালায়। ভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখা, কাজের মধ্য দিয়ে শেখা, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শেখা মহান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পদ্ধতির মূল নীতি ছিল। এ দিক থেকে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দ্ধতি কর্ম -প্রকল্প ভিত্তিক। আপনার সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জিজ্ঞাসু মনের ক্ষুধা মিটিয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষায় নিবিষ্ট হবে।

''আমায় অন্ধকার থেকে জ্ঞানালোকে নিয়ে চল
মৃত্যু হতে আমায় অমৃতলোকে উত্তরণ কর।''

এই চলার কাজকে যিনি দায়িত্ব ও নিষ্ঠাভরে মননের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন তিনিই শিক্ষক রূপে পরিগণিত হবেন। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পুনরুজ্জীবনে জীবনীশক্তিদায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। কেননা একটি জাতির প্রগতি বা উন্নতি নির্ভর করে যুবসম্প্রদায়ের চরিত্র এবং নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার উপর। এই শিক্ষক সম্পর্কে তিনি বলেছেন - 'যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোন মতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তারই লইবার অধিকার ী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীন ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করতে

পারেন ; যারা জানেন শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা, যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ [illegible] হন না।''[৮] গুরুর অন্তরের ছেলে মানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে [illegible] তিনি ছেলের ভাড় নেবার অযোগ্য হন। যিনি যাত শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তার ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাঁসি। গুরুকে বিদ্যাসৃষ্টির সাধনা করতে হবে, তবেই শিষ্য বিদ্যা গ্রহণের সাধনা করবে, আর তখনই সম্পূর্ণদান ও সম্পূর্ণ গ্রহণ সম্ভবপর হবে। গুরু শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বয়ের ভিতর দিয়েই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোনিত স্রোতের মতো সঞ্চালন করতে পারবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা চিন্তায় শিক্ষালয়ের রূপটিকে খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। প্রচলিত স্কুল সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল 'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। ... ছাত্ররা দুই - চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হওয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।''[৯] এই শিক্ষাকে তিনি শুস্ক ও নির্জীব বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সানিধ্যে পরিপূর্ণ শিক্ষার আদর্শ থেকেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের কল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন 'তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন, এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিত ভাবে উপলব্ধি করেছে। শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সুহৃদয় শিক্ষক। এই বনে এই গুরু গৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। তাই আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নিজেকে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। তিনি বিদ্যালয় সম্পর্কে আরও বলেন 'বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক, এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে।'[১০] ছাত্ররা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নয় কাজের সম্বন্ধও গড়ে তুলবে। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী করে বিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

শান্তিনিকেতন প্রথম দিকে ছিল একেশ্বরবাদীদের নিভৃত সাধনাস্থল। কবি এখানে তাঁর সেই আসনই পাতলেন, যেখানে মানব কল্যানকর সকল প্রকার সাধনার সমাবেশ হল, কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, আশ্রম হল সর্বজনের একটি তীর্থস্থল। সেটি হল সমাজচেতনায় বৃহত্তর , তেমনি নিল তার সঙ্গে বৃহত্তম মানুষ গঠনের দায়িত্ব। শান্তিনিকেতন রূপান্তরিত হল বিশ্বভারতীতে, যেখানে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন 'যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য, সেই আত্মীয়তার আসন এখানে পাতাব।' যাত্রা বিশ্বং ভাবত্যেকনীড়ম্।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও কর্মজীবন যেমন অচ্ছেদ্য, তেমনি জীবন দর্শন, সমাজ র্শন তথা শিক্ষা দর্শন ও ঔপনিবেশবাদ বিরোধী শিক্ষাচিন্তা ও তার প্রয়োগও ছিল অবিচ্ছি । বিদেশী বা স্বদেশী, ইংরাজী বা হিন্দি কোন এক ভাষার যোগে ভারতবর্ষে শিক্ষা-চিন্তা ও বিদ্যার ঐক্য বিধানের কল্পনা অবাস্তব, কেননা তা মানুষের প্রকৃতি- বিরুদ্ধ ইতিহাস বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষের সবগুলি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাকে প্রদীপ্ত করে তাদের সমবায়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেয়ালি উৎসবের ব্যবস্থা করলে তবেই ভারতীয় চিত্তের ঐক্য উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট অভিমত । ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থা বৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধান পূর্বক অভিনিবেশ পূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদেব কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় বই পড়িয়া মাত্র কখনো হইতে পারে না।' আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্য যদি বাংলার সর্বজনের মধ্যে পরিব্যপ্ত হত এবং তার পরিণাম স্বরূপ সর্বত্র একমানসিকতা দেখাদিত তাহলে ইংরেজের কূটনীতি আমাদের মধ্যে এক সর্বনাশা বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত না। আর বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন , বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন।

এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান — কবির এই আকুল আকাঙ্খাও এমনভাবে ব্যর্থ হতে পারত না। 'জনগন-মন- অধিনায়ক', গানটিতে যে বৈশিষ্ট্য, তা কথা, সুর ও অখণ্ড রূপ সব মিলিয়ে ন্যাশনাল অ্যান্থেম হিসাবে এর সৌন্দর্য ও উপযোগিতা নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার বানী ও মাত্রা প্রাদেশিক অভিমানের অনেক উর্দ্ধে। ভারতের নিজস্ব গৌরব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন 'বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্তগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভোব।'[১১] কালক্রমে এর সঙ্গে মিলেছে মুসলিম সংস্কৃতি এবং সর্বশেষে ইউরোপের বিজ্ঞান। তাই তিনি বলেছেন জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সঞ্চয় করতে হবে। সুতরাং শিক্ষা হবে জাতীয়বিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যার সম্মিলিত রূপ। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে নানান বিতর্ক ও তার সুষ্ঠ রূপায়নের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র নাথের শিক্ষা দর্শন ও তার প্রয়োগিক রূপটি যথেষ্ট অর্থবহ। সাক্ষরতা, মাতৃভাষায় শিক্ষাদা ন, গতানুগতিক পাঠক্রমের যান্ত্রিকতা, বিদ্যালয়ের কৃত্রিম পরিমন্ডল, শিক্ষার বৃত্তিমুখীনতা স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি নিয়ে নানান সমস্যার আবর্তে বর্তমান জর্জরিত। এই প্রক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন শুধু তত্ত্ব হিসাবে নয় এর প্রয়োগ ও যথেষ্ঠ উজ্জ্বল তাঁর শান্তিনিকেতনের তপোবন শিক্ষায়। নিত্ত নতু ন ছন্দ ফুটেছে তাঁর কাব্যে, গানে, নৃত্যে, চিত্রে, অভিনয়ে অসংখ্য বৈচিত্রের মিলিত বিশ্বই যে তাঁর কাছে অখণ্ড সত্তার ভগবান। জ্ঞানে তাঁর সামগ্রিক উপলব্ধি, কর্মে তাঁর নিবিড় সংযো গ। ভারতের কোনো বিশেষ অঞ্চলের নয়, ভারতের সমস্ত অঞ্চলের অখণ্ড ও চিরন্তন রূপমা

ধুরী তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর মতে ব্যক্তি কোনো বিশেষ ধর্মের বা
ত জাতি গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী নয়।

গ্রন্থসূত্র

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, চিত্রা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৮২, পৃষ্ঠা ২১

২। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) ধর্মশিক্ষা (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা,১৩৮৯, পৃষ্ঠা ১১০

৩। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) তপোবন (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা,১৩৮৯, পৃষ্ঠা ৯৮

৪। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) শিক্ষার হেরফের (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা,১৩৮৯, পৃষ্ঠা ১০

৫। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) শিক্ষার হেরফের (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা,১৩৮৯, পৃষ্ঠা ১০

৬। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) শিক্ষার বাহন (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃষ্ঠা ১৫১

৭। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) আশ্রমের শিক্ষা (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা,১৩৮৯, পৃষ্ঠা ২৪৬

৮। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) ছাত্র শাসনতন্ত্র (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃষ্ঠা ১৬০-৬১

৯। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) শিক্ষাসমস্যা (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা,১৩৮৯, পৃষ্ঠা ৩৯

১০। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) শিক্ষাসমস্যা (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃষ্ঠা ৪৭

১১। রবীন্দ্রনাথঠাকুর, শিক্ষা (মূলগ্রন্থ) বিদ্যাসমবায় (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃষ্ঠা ১৭৮